

দ্যা ফাইনাল ম্যাসেঞ্জার

ড. মাজিদ আলি খান

অনুবাদ
রেজায়ি সেন্টার



আরব উপদ্বীপের ঐতিহাসিক পটভূমি মানবসভ্যতার শুরুর কথা

ইসলাম; আল্লাহ তায়ালায় নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা, যার সূচনা হয়েছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব এবং সর্বপ্রথম নবি আদম عليه السلام থেকে। তাঁর পরে প্রেরিত নুহ, ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইউসুফ, মুসা, সোলায়মান ও ঈসা عليه السلام সহ সকল নবি-রাসূল এই একই তাওহিদবাদী ধর্ম ‘ইসলাম’ প্রচার করেছিলেন। আর মানুষকে ডেকেছিলেন এক আল্লাহ তায়ালায় দিকে। যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে অবশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদ عليه السلام-এর ওপর অবতীর্ণ হয় আল কুরআন; যা ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাধুনিক বিধান।

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণ করে দিলাম। ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।’ সূরা মায়দা : ৩


অধিকাংশ নবিগণেরই আগমন ঘটেছে মধ্যপ্রাচ্যে। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তৃতি বর্তমান পারস্য (ইরান) থেকে শুরু করে মিশর পর্যন্ত। ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিশর, আরব উপদ্বীপ, তুরস্ক (আনাতোলিয়া, এশিয়া মাইনর) ও ইরান মানচিত্রের ‘অর্ধচন্দ্রাকার’ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, যা ছিল ইসলামের উর্বর ভূমি। ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে একমত, এটিই হলো মানবসভ্যতার আদি বাসস্থান।^১ একে ঘিরেই পৃথিবীর আদি সভ্যতাগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। ঐতিহাসিকভাবেও মধ্যপ্রাচ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মনুষ্যসভ্যতার যত প্রাচীন, আকর্ষণীয় ও স্থায়ী আবিষ্কার রয়েছে—সবই এ অঞ্চলের উপহার। অঞ্চলটি বিজ্ঞান, শিল্পকলা, দর্শন ও সাহিত্য ইত্যাদি বহু ঐতিহ্যকে বর্তমান প্রজন্মের মননে প্রোথিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যই পৃথিবীর একমাত্র অঞ্চল, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছরের সমৃদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি ধারণ করেছে।

মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) সুমেরীয় ও মিশরের হ্যামাইট জাতি নগরসভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা।^২ প্রাক-সেমিটিক সুমেরীয়দের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভাব বিস্তার


^১ পি. কে. হিট্টি, ‘The Near East in History’, নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩

^২ পি. কে. হিট্টি, ‘The Near East in History’, নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩২

করেছিল দজলা-ফোরাতে উপত্যকা জুড়ে; ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশের অঞ্চলগুলোতেও। সেমিটিক ছাড়াও তারা অন্য আরেকটি ভাষায় কথা বলত। ধারণা করা হয়, এরা ভূমধ্যসাগরীয় ও ককেশীয়দের মিশ্র জাতি।

লম্বাটে মাথা ও অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার ভূমধ্যসাগরীয়রা আদিতে উত্তর আফ্রিকায় বাস করত, যারা হ্যামাইট নামে পরিচিত। ধারণা করা হয়, এরা নুহ -এর দ্বিতীয় সন্তান হামের বংশধর। পরবর্তী সময়ে ভূমধ্যসাগরীয়দের একাংশ ইউরোপের দক্ষিণাংশে প্রত্যাবর্তন করে। এরাই স্পেন, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ এমনকী ব্রিটেন ও জার্মানির অধিকাংশ মানুষের পূর্বপুরুষ।^৩ হ্যামাইটদের আরেক অংশ ‘বাব আল মানদিব’ হয়ে আরব উপদ্বীপে চলে আসে। পরিশেষে ‘অর্ধচন্দ্রাকার’ অঞ্চলে পৌঁছায়। এ সময় তারা এসব অঞ্চলের আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। তারাই মূলত সুমেরীয়দের আদি পুরুষ।

আর্মেনীয়দের (যারা আলপাইন হিসেবেও পরিচিত) বৃহৎ ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর (আর্য) বংশোদ্ভূত বলে মনে করা হয়। আর্যরা দেখতে গোলগাল মাথা, বলিষ্ঠ গড়ন ও মাঝারি উচ্চতার। এদের জন্মভূমি মধ্য এশিয়া অথবা পশ্চিম এশিয়া; সম্ভবত উত্তর ককেশীয় শুষ্ক অঞ্চল। বহু পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি দুটো বৃহৎ শাখায় বিভক্ত হয়েপড়ে। একটি শাখা পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ হয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে। গ্রিক, কেলটিক, জার্মান এবং খুব সম্ভবত স্ক্যান্ডিনেভিয়ানসহ আর্মেনীয় বা আলপাইন হিসেবে বিবেচিত সকল জাতির পূর্বপুরুষ এরাই। ইন্দো-ইউরোপীয়দের অন্য শাখাটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলে যায় এবং পারস্য মালভূমি অঞ্চলে বসতি গড়ে। এই গোষ্ঠীটিই প্রাচীন পারস্যান ও মেডাসদের পূর্বপুরুষ। এদের একটা অংশ সিন্ধু ও ভাগীরথী উপত্যকা হয়ে পর্বতাঞ্চল পেরিয়ে উত্তর ভারতে বসবাস শুরু করে। ঠিক একই সময়ে আর্মেনীয়দের একাংশ আনাতোলিয়া, সিরিয়া ও লেবানন হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের ‘অর্ধচন্দ্রাকার’ অঞ্চলে এসেছিল।^৪

সেমিটিকরা নুহ -এর জ্যেষ্ঠপুত্র শাম-এর বংশোদ্ভূত। সেমিটিকদের মূল আবাস মানবজাতির অন্যতম আদি বাসস্থান আরব উপদ্বীপে। সেখান থেকে তারা ‘উর্বর অর্ধচন্দ্রাকার’ অঞ্চলের উত্তরে চলে যায়।^৫ সেমিটিকদের থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাবিলনীয়, আশুরীয়, লেবাননের ফিনিশীয়, সিরীয় ও হিব্রু ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী অন্যতম।^৬ তবে আধুনিক ধারণামতে—সুমেরীয়, হ্যামাইট, সেমিটীয়রা জাতিগত পরিচয়ের পরিবর্তে ভাষাগত গোষ্ঠী হিসেবেই বেশি বিবেচিত। সেমিটীয় তাকেই বলা হয়—যিনি আরবি, আসিরীয় বা ব্যাবিলনীয়, আরামাইক বা সিরীয়, হিব্রু কিংবা ইথিওপীয় ইত্যাদি ভাষায় কথা বলেন। এসব ভাষার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং সবগুলোই সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

৩. পি. কে. হিট্টি, ‘The Near East in History’, নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩৩

৪. পি. কে. হিট্টি, ‘The Near East in History’, নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩৩

৫. সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, ‘তারিখে আরদুল কুরআন’, আজমগড় (ভারত), (১৯৫৫), খণ্ড-১, পৃ.-১০৯-১১৩; পি. কে. হিট্টি, ‘The Near East in History’, নিউ ইয়র্ক (১৯৬১), পৃ.-৩৩

৬. সাইয়েদ সুলাইমান নদভী, ‘তারিখে আরদুল কুরআন’, আজমগড় (ভারত), (১৯৫৫), খণ্ড-১, পৃ.-১০৯-১১৩; পি. কে. হিট্টি, ‘History of The Arabs’, লন্ডন, (১৯৫৮), পৃ.-৩-১৩

আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক পটভূমি

ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত জাজিরাতুল আরব বা আরব-উপদ্বীপ তিন দিকে সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত; পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর ও ওমান উপসাগর এবং দক্ষিণে আরব সাগর উপদ্বীপটির বৈচিত্র্যতায় এক অনন্য মাত্রা যোগ করেছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্বে তৎকালীন বিশ্ব-মানচিত্রে আরব উপদ্বীপ ছিল সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থল। আরব উপদ্বীপটি (জাজিরাতুল আরব) এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে অর্থাৎ তিনটি মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। উপদ্বীপের তালিকায় ১,৩০০,০ বর্গমাইলজুড়ে বিস্তৃত অঞ্চলটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ^১ হেজাজ, নজদ, ইয়েমেন ও ওমানসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে বিভক্ত উপদ্বীপটি ভৌগোলিকভাবে মূলত আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির একটি সম্প্রসারিত অঞ্চল, যা নীলনদ ও লোহিত সাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

আরব উপদ্বীপের সমুদ্রতীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উচ্চতা প্রায় ৬০ থেকে ৯০ ফুট। ইসলামের উৎপত্তিস্থল পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর হেজাজের অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র উপদ্বীপটি শুষ্ক। এর দক্ষিণাংশ ইয়েমেনই একমাত্র এলাকা—যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ও চাষাবাদ হয়। উত্তরে অবস্থিত নজদ পশু পালকদের জন্য উত্তম চারণভূমি। বাকি প্রায় সমগ্র উপদ্বীপটি অনুর্বর, বিক্ষিপ্ত মরুভূমিতে ভরপুর।

আরবের এই বিশাল এলাকাজুড়ে (বর্তমান সৌদি আরব) মাত্র ৭৭, ০০, ০ (১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ) জন মানুষ বাস করে। কেননা, অঞ্চলটির বৃহদাংশই বালুকাময় মরুভূমি এবং প্রায় অর্ধেকের বেশি জায়গা বসবাসের অযোগ্য। গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যধিক গরম পড়ে। এর উপকূলবর্তী অঞ্চল পৃথিবীর সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল; থার্মোমিটারে যার তাপমাত্রা গ্রীষ্মকালে ১১৮-১৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে।

এখানে চিরসবুজ কোনো নদী নেই, আর না আছে কোনো বনভূমি। গোটা আরবে চারটি জলাশয় বিদ্যমান : আহসা, খারজ, আফলাজ ও নাজরান—যেগুলোকে পুরোপুরি লেক বা হ্রদ বলা যায় না। এ ছাড়া উপদ্বীপের বিভিন্ন অংশ বিশেষত মদিনা, তায়েফ, ইয়েমেন, হাজরামাউত, ওমান ও মক্কায় অনেকগুলো ঝরনা ও কূপ রয়েছে। তন্মধ্যে মক্কায় অবস্থিত জমজম কূপ পৃথিবীজুড়ে বিখ্যাত।

^১. মুহাম্মাদ রাবে নদভী, 'জুগরাফিয়াতু জাজিরাতুল আরাব', লখনৌ, ১৯৬২, খণ্ড-১ পৃ.-১৭৫


উপদ্বীপটি প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত—

১. নজদ : এটি মরুভূমির মূল কেন্দ্র। অনেকগুলো উপত্যকা ও মরুদ্যান অঞ্চলটিকে জনমানুষের আবাসযোগ্য করে তুলেছে।
২. উত্তর দিকে নুফুদ, পূর্বে দাহনা ও দক্ষিণে রুবআল প্রায় গোটা বালুকাময় অঞ্চল নজদকে বেষ্টিত করে আছে।
৩. বিশাল বিস্তীর্ণ সমুদ্র উপকূলবিশিষ্ট সিরিয়া মরুভূমি (বাদিয়াতুশ-শাম), মাদইয়ান, হেজাজ, আসির, ইয়েমেন, হাজরামাউত, ওমান ও হাসা (আল আহসা) দ্বিতীয় অংশকে (উপরোল্লিখিত বালুকাময় অঞ্চল) বেষ্টিত করে আছে। এর কোনো অংশ বৃক্ষলতাহীন অনুর্বর, আবার কোনো অংশ কমবেশি জনবহুল ও আবাসযোগ্য। হাজরামাউতের কিছু এলাকা এবং ইয়েমেন ও আসিরের উঁচু অঞ্চলের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া সেখানকার নিয়মিত বৃষ্টিপাত ও মাটির উর্বরতায় ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া জাবালে আখবার থেকে প্রবাহিত পানির সাহায্যে ওমানে চাষাবাদ করা হয়। এটি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি উৎপাদনশীল। তড়িন্ন মাদইয়ান, কাসিম ও হাসানের মরুদ্যানগুলোও কিছুটা উর্বর।

আরবীয় পণ্য ও প্রাণী

ধনী, অভাবী সবার বন্ধু খেজুর গাছ আরবের প্রধান বৃক্ষ। জনপ্রিয় সুস্বাদু খেজুর উৎপাদন ছাড়াও এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। গাছের শাখা পল্লি অঞ্চলে ঘরের ছাউনি তৈরিতে কাজে লাগে; খেজুরের আঁটি গুঁড়ো করে উটের খাদ্য তৈরি করা হয়। আর বাকলের শক্ত আঁশ দিয়ে রশি তৈরি করা হয়।

খেজুর ছাড়াও তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদিত হয়। উপদ্বীপের সবচেয়ে উর্বর ভূমি ইয়েমেনে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গম, কফি ও ফলফলাদি উৎপন্ন হয়।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, ভেড়া ও বকরি অন্যতম। উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ। উট শুধু পণ্য-সামগ্রী বহনই কাজে লাগে না; এর মাংস ও দুধও অনেক উপকারী। তৎকালীন সমাজে যৌতুক, রক্তের মূল্য পরিশোধ, জুয়ার পুরস্কার, গোত্রপতিদের সম্পদ ইত্যাদি সবকিছুর হিসাব করা হতো উটের সংখ্যার ভিত্তিতে। উমর  একবার বলছিলেন—‘উটের সমৃদ্ধিই হলো আরবদের সমৃদ্ধি।’ উল্লেখ্য, ইসলামের প্রাথমিক যুদ্ধগুলোতে উটের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

মক্কার মিশন

হেরা গুহায় ধ্যান

ক্রমেই নবিজির ব্যবসায়িক কাজে আগ্রহের কুপি নিভুনিভু করতে লাগল। মক্কার সন্নিহিত প্রখ্যাত ‘হেরা’ গুহায় তিনি প্রায়শই ধ্যানমগ্ন থাকতেন।^৮ কখনো কখনো দীর্ঘ মাস-রজনি পার হয়ে যেত মগ্নতায়; বিশেষত রমজানে। সাধারণত তিনি সঙ্গে কিছু খাবার ও পানীয় নিয়ে যেতেন। সেগুলো শেষ হলে আবার ফিরে আসতেন। মূলত সেখানে তিনি ধ্যান করতেন, মহান আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করতেন আর ভাবতেন, জীবনের এত এত সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। এ সময়গুলোতে আল্লাহর মহিমাস্বরূপ নবিজির কিছু স্বপ্ন বাস্তবেও ঘটে যেত।^৯

এভাবে রাসূল ﷺ মানুষের প্রতিমাপূজা আর অমানবিক কার্যাবলি নিয়ে গভীর চিন্তিত থাকতেন। প্রিয়নবির বয়স তখন চল্লিশ ছুঁইছুঁই। চিন্তার অভিপ্রায়ও দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। মানুষের আদর্শিক ও নৈতিক পদস্খলন, কানুনিক হাল-হাকিকতের বিকৃতি তাঁর মননে গভীর রেখাপাত করত। তিনি ডুব দিতেন চিন্তার অতলে। সর্বদা সন্ধানের রত থাকতেন সত্য-সঠিক পথের। ছিলেন দিক্‌দ্রাস্তাও। যেমনটা পরবর্তী সময়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

‘তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথহারা; অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন।’ সূরা দোহা : ৭

ওহির আবির্ভাব

সত্য পথের খোঁজে নবিজি প্রায় সাত বছর হেরা গুহায় যাতায়াত করেন। নবুয়তপ্রাপ্তির ঠিক পূর্বের ছয় মাস যাতায়াতের পরিমাণ বাড়িয়ে দেন। আর এ সময় ঘনঘন সত্য স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

এবার তিনি পৌঁছে যান প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও বুঝের পূর্ণতার বয়স চল্লিশে। এ বয়সে মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা পায়, পাশবিক আচরণগুলো দূরীভূত ও যুবাসুলভ আকাঙ্ক্ষাগুলো মরে গিয়ে আত্মিক কারদানি পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসের কোনো একদিন (মুহাম্মাদ ইবনে সাদের মতে ১৭ রমজান) নবিজি সেই গুহায় গভীর ধ্যানমগ্নতায় নিমগ্ন। চারদিকের পরিবেশ অন্যদিনের চাইতে একটু বেশি নিরুন্ম,

৮. বুখারি, অধ্যায় : ‘বাবুল ওয়াহি’, খণ্ড-১, পৃ.-২; আল্লামা শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, আজমগড় (ভারত), ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ.-১৯৯; ইবনে খালদুন, ‘তারিখ’, বৈরুত, (১৯৬৬), খণ্ড-২, পৃ.-৭১৪

৯. আবদুর রহমান সুহাইলি, ‘আর রাউদুল উনুফ’, খণ্ড-১, পৃ.-১৫৩; ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, বৈরুত, ১৯৬০ (১৩৮০), খণ্ড-১, পৃ.-১৯৪; বুখারি, অধ্যায় : ‘বাবুল ওয়াহি’, খণ্ড-১, পৃ.-২; মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক’, কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৮

নিস্তন্ধ, নিশ্চল। এ সময় তিনি ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام-কে দেখতে পান। তিনি নবিজিকে পড়তে আদেশ দেন।^{১০} ভয়ে, আতঙ্কে তিনি থরথর করে কেঁপে উঠলেন। নবি عليه السلام ছিলেন ‘উম্মি’ (নিরক্ষর)। তিনি পড়তে জানতেন না। কম্পিত কণ্ঠে বললেন—‘আমি পড়তে জানি না।’ ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام তাঁকে সনির্বন্ধ আলিঙ্গন করলেন। এরপর দ্বিতীয়বার পড়তে বললেন। কিন্তু প্রিয়নবি এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। জিবরাইল عليه السلام তাঁকে আবারও আলিঙ্গন করলেন। এরপর আওড়াতে শুরু করলেন^{১১}—

‘পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালুর নামে; যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।’ সূরা আলাক : ১-৫

উপরিউক্ত বাক্যগুলো নবিয়ে রহমতের ওপর নাজিলকৃত প্রথম ওহি। ফেরেশতা জিবরাইল عليه السلام-এর সুরত দর্শন ছিল নবিজির জন্য এক ভিন্ন রকমের অনুভূতি। তিনি ভয়ে কম্পমান অবস্থায় দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এলেন। খাদিজা عليها السلام-কে বললেন—‘আমাকে ঢেকে দাও! আমাকে ঢেকে দাও!’ স্ত্রী খাদিজা عليها السلام তাঁকে কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে দিলেন। ভয় দূরীভূত হওয়ার পর তিনি প্রিয়তমা স্ত্রীর নিকট সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। কম্পিত কণ্ঠে জানালেন—‘আমি আমার জীবনের আশঙ্কা করছি।’ খাদিজা عليها السلام পরম ভালোবাসায় তাঁকে আশ্বাস দিলেন। বললেন— ‘আল্লাহর শপথ! তিনি আপনার ক্ষতি হতে দেবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখেন, বন্ধুদের সহযোগিতা করেন, অন্যের বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে তাদের কষ্ট দূর করেন। আপনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ও ইনসাফ কায়েমে অগ্রবর্তী।’^{১২}

^{১০} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, বৈরুত, ১৯৬০ (১৩৮০), খণ্ড-১, পৃ.-১৯২; মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক’, কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৮-১৯৯

^{১১} বুখারি, অধ্যায় : ‘বাবুল ওয়াহি’, খণ্ড-১, পৃ.-২ ৩; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, কায়রো, ১৯৫৫ (১৩৭৫), বই-১, (খণ্ড-১ ও ২), পৃ.-২৩৬; মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক’, কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৯; আল্লামা শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, আজমগড় (ভারত), ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ.-২০১-২০৩; আরও দেখুন ‘আদ-দুরার’, ইবনে আবদুল বার (পৃ.-৩৩-৩৪); আবদুর রহমান সুহাইলি, ‘আর রাউদুল উনুফ’, আবদুর রহমান সুহাইলি, (খণ্ড-১, পৃ.-১৫৩); ও মুসলিম।

^{১২} মুহাম্মাদ ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক’, কায়রো, ১৯৬০, খণ্ড-২, পৃ.-২৯৯; বুখারি, অধ্যায় : ‘বাবুল ওয়াহি’, খণ্ড-১, পৃ.-৩; আল্লামা শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, আজমগড় (ভারত), ১৯৬২, খণ্ড-১, পৃ.-২০৩; আরও দেখুন ‘আদ-দুরার’, ইবনে আবদুল বার (পৃ.-৩৪); ও ‘মুসলিম।

হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ

মদিনায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের চক্রান্ত

নবিজি ও সাহাবিগণ মদিনায় হিজরত করলেও কুরাইশ মুশরিকরা মুসলিমগণ ও ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে জমে থাকা ক্ষোভ দূর করতে পারেনি। তারা নবিজির ক্রমবর্ধমান সফলতাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছিল না। ফলে মদিনায় মুসলিমদের ক্রমশ সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষে ঈর্ষান্বিত প্রকাশ করে। কুরাইশরা মুসলিমদের উঠতি প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে দমিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নতুন করে ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকে। কদর্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের রাহবার হিসেবে মদিনায় উপযুক্ত মানুষটাকেও পেয়ে যায় তারা। সে আর কেউ নয়; মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে মদিনাবাসীরা তাদের সর্দার হিসেবে নির্বাচিত করার প্রাক্কালে নবিজি মদিনায় আসেন। উবাইয়ের নেতা হওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ততদিনে আল্লাহর রাসূল ﷺ মদিনার একজন বিজ্ঞ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন। তিনি এতটাই প্রভাবশালী চরিত্রে পরিণত হন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে নিষ্প্রভ হয়ে যায়; অথচ সে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পূর্বে মদিনার সর্বসর্বা ছিল।^{১০} তাই স্বভাবতই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নবিজি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ এবং ঘৃণার আগুনে জ্বলে আট আঙারি হয়ে যায়।

কুরাইশরা নবিজি ও সাহাবিদের প্রতি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর শত্রুতাপূর্ণ আচরণ ও মনোভাব সম্পর্কে জানতে পারে। তাই এবার তারা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের মদিনা থেকে বিতাড়নের চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এ হীন উদ্দেশ্যে কুরাইশরা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হুমকিস্বরূপ একটি চিঠি লিখে। চিঠিটি ছিল—‘আমাদের লোকদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে তোমরা মুহাম্মাদকে হয় হত্যা করবে; নতুবা মদিনা থেকে বের করে দেবে। যদি এটি করতে না পারো, তবে আমরা তোমাদের আক্রমণ করব এবং ধ্বংস করে দেবো। আর তোমাদের নারীদের বন্দি করা হবে।’^{১১} নবিজি এই চিঠি সম্পর্কে জানার পর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর কাছে যান। বলেন—‘তুমি কি তোমার নিজের ভাই ও পুত্রদের সঙ্গে

^{১০} ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-১, (খণ্ড-১ ও ২), পৃ.-৫৮৪; আবদুর রহমান সুহাইলি, ‘আর-রাউদুল-উনুফ’, খণ্ড-২, পৃ.-৫১

^{১১} শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, খণ্ড-১, পৃ.-৩০৫; আবু দাউদ

চূড়ান্ত যুদ্ধে জড়াতে চাচ্ছে?’^{১৫} আবদুল্লাহ ইবনে উবাই নিজ দলের লোকদের তার বিরুদ্ধে চলে যাওয়ার ভয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি কু-কর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

কুরাইশরা যখন উপলব্ধি করল আবদুল্লাহকে দিয়ে লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না, তখন তারা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী এলাকার অধিবাসীদের দিকে মনোনিবেশ করল। মদিনার মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে উসকানি দিতে শুরু করল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনায় আস্তে আস্তে তার পূর্বের প্রভাবশালী অবস্থান হারিয়ে ফেলে। মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চললেও সে ভেতরে ভেতরে ঘৃণার চাষাবাদ করত। মুসলমানরা ইহুদিদের ব্যাপারেও যতদূর সম্ভব সতর্ক অবস্থানে থাকত। আদতে তাদের বিশ্বাস করাটাও নিরাপদ ছিল না। মুখে প্রকাশ না করলেও নবিজি ও মুসলিমদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে তাদের অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। তারা যেকোনো মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতার মুখোশ খুলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি দ্রোহে লিপ্ত হতে পারে—এমন আশঙ্কা ছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন—‘মদিনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ ও মুসলিমগণ ত্রিদলীয় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল— কুরাইশ, ইহুদি ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর নেতৃত্বে মুনাফিক গোষ্ঠী।’^{১৬}

মুসলমানগণ অতিমাত্রার কপটতা হেতু মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। মুনাফিকরা প্রত্যেকেই ভেতরে শত্রুতা লুকিয়ে রেখে প্রকাশ্যে ভালো আচরণ দেখাচ্ছিল। তারা ছিল ঘরের শত্রু। ফলে মুসলিমরা যেকোনো মুহূর্তে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের আক্রমণের ভয়ে থাকতেন। এই অস্থির পরিস্থিতি উবাই ইবনে কাব খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—‘নবিজি ও মুজাহির সাহাবিগণ মদিনায় আনসারদের জিম্মায় ছিলেন। ওদিকে কুরাইশদের চক্রান্তে গোটা আরব তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতটাই ঘোলাটে হয়ে পড়েছিল যে, সাহাবিগণ রাতে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় ঘুমোতে যেতেন।’^{১৭}

এ সময়ই নবিজি ওহি মারফত^{১৮} আত্মরক্ষার্থে তরবারি ব্যবহারের অনুমতিপ্রাপ্ত হন।

‘আল্লাহর রাহে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; অবশ্য কারও প্রতি সীমালঙ্ঘন করবে না।’ সূরা বাকারা : ১৯০

নবিজির সতর্ক অবস্থান

উপরিউক্ত ওহি স্পষ্ট করে বলেছে, এখন থেকে শত্রুদের সাথে মুসলিমদের আচরণ কীরূপ হবে। নবিজি সিদ্ধান্ত নিলেন—এই আসন্ন পরিস্থিতিতে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকার। এ ছাড়া তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সতর্কতামূলক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন।

^{১৫} শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, খণ্ড-১, পৃ.-৩০৬

^{১৬} ড. মাজিদ আলি খান, ‘The Last Prophet’, পৃ.-৩৯

^{১৭} বুখারি, ‘লি-বাব ফি-আসবাব আত-তানজিল’; ‘মুসনাদ আহমাদ’; ‘আবু দাউদ’; শিবলি নোমানি, ‘সিরাতুন-নবি’, খণ্ড-১, পৃ.-৩০৮

^{১৮} ইবনে জারির আত-তাবারি, তাফসির; ইবনে আবদুল বার, ‘আদ-দুরার’ এর পাদটীকা, পৃ.-১০৩; মুহাম্মাদ হুসাইন হাইকাল, ‘হায়াত মুহাম্মাদ’, উর্দু অনুবাদ, পৃ.-৪৭৯; ইবনুল কাইয়িম, ‘জাদুল মাআদ’, খণ্ড-১, পৃ.-৩১৪

হিজরি তৃতীয় বর্ষ

ইহুদিদের বদর যুদ্ধপরবর্তী বিশ্বাসঘাতকতা

বনু কাইনুকা যুদ্ধের আলোচনায় আমরা ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে আবছা ধারণা পেয়েছি, আর এখানে কিছুটা বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব।

বদর যুদ্ধের পর ইহুদিরা নবিজির বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু করে। হুয়াই ইবনে আখতাব, সাল্লাম ইবনে হুকাইক, আবু রাফি, আল রাবি ইবনুল রাবি ইবনে আবুল হুকাইক, কাব ইবনে আশরাফ ও আবু আম্মারসহ নেতৃস্থানীয় ইহুদি ব্যক্তিবর্গের একটি প্রতিনিধি দল কুরাইশ, গাতফান ও বনু কুরায়জাকে^{১৯} মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার হীন উদ্দেশ্যে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

ইহুদিরা কুরাইশদের সাক্ষাতের জন্য মক্কায় ধরনা দিলে কুরাইশরা বলে— ‘তোমরা ইহুদিদের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। আসমানি কিতাবের অধিকারী। তা ছাড়া আমরা আর মুহাম্মাদ উভয়ের সম্পর্কেই তোমরা ভালোভাবে অবগত। তাহলে বলো তো, কাদের ধর্ম উত্তম?’ ইহুদিরা উত্তর দিলো—‘মুহাম্মাদের ধর্ম থেকে তোমাদের ধর্ম শ্রেষ্ঠতর, আর তোমরাই সঠিক পথের ওপর আছ।’ নবিজি ওহি^{২০}

মারফত ইহুদিদের এহেন বিদ্বেষপূর্ণ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হন। তারা আল্লাহর দ্বীনের ওপর পৌত্তলিকতাকে শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিচ্ছে; অথচ তারা আসমানি কিতাবের দাবিদার। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন—

‘তুমি কি তাদের দেখনি, যাদের কিতাবের জ্ঞান থেকে কিছু অংশ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের অবস্থা হচ্ছে এই, তারা “জিবত” ও “তাগুত”কে মানে আর কাফিরদের সম্বন্ধে বলে, ঈমানদারদের তুলনায় অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত? এই ধরনের লোকদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিশপ্ত করেন, তার জন্য তুমি কোনো সাহায্যকারী পাবে না।’ সূরা নিসা : ৫১-৫২

^{১৯}. অধ্যাপক আকবরাবাদি, ‘আহদে নাবাওয়ী কে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ’: ‘বুরহান’ (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৫ (৭)

^{২০}. অধ্যাপক আকবরাবাদি, ‘আহদে নাবাওয়ী কে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ’: ‘বুরহান’ (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৬

নোট : তাগুত ও জিবত আহলে কিতাবদের দুটি মূর্তির নাম।

উপরিউক্ত প্রতিনিধি দলে কতক অনিষ্টকর, ফিতনাবাজ লোকও ছিল। তারা সাধারণ মানুষদের ইসলাম গ্রহণে নিরুৎসাহিত করত। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে—^{২১}

‘তাদের কাছে সত্য প্রকাশ পাওয়ার পরও অনেক কিতাবধারী (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) ঈর্ষাবশত তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর আবার তোমাদের কাফির বানাতে চায়। তোমরা ক্ষমা করে যাও এবং উপেক্ষা করতে থাকো—যতক্ষণ না আল্লাহ (এ ব্যাপারে) তাঁর হুকুম প্রদান করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।’ সূরা বাকারা : ১০৯

কাব ইবনে আশরাফ

তৎকালীন আরবে কারও বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ অপপ্রচার চালানোর প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কবিতা ব্যবহৃত হতো। কবিদের মূল দায়িত্ব ছিল কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ঘৃণা আর প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা উসকে দেওয়া। ইহুদিরাও বসে থাকল না। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে এই হাতিয়ার কাজে লাগাল। কাব ইবনে আশরাফ ছিল ইহুদি কবিদের মধ্যে অন্যতম। সুদর্শন চেহারার কাব কবিতার মাধ্যমে সহজ-সরল ও সুন্দরী নারীদের হৃদয় কেড়ে তার লাম্পট্য কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করত। প্রতিবেশী গোত্রগুলোর সাথেও তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

মহানবি ﷺ-এর প্রতি ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় তার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ। বদরের বিজয় তাকে আরও উসকে দেয়। বদর যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর অসামান্য সাফল্য সে মেনে নিতে পারেনি, যার দরুন সে ক্ষুব্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বদর যুদ্ধের পর সে (উপরোল্লিখিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে) মক্কায যায়। যুদ্ধে নিহত কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নামে বিষাদ সংগীত রচনা করে। অতঃপর করণ সুরে সেগুলো গাইতে থাকে। সে কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধের প্রতি উসকে দেয়।^{২২} তাদের আন্দোলিত করতে থাকে, তারা যেন বদরে নিহত নেতৃবৃন্দের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আরেকটি যুদ্ধে জড়ায়।

^{২১} অধ্যাপক আকবরাবাদি, ‘আহদে নাবাওয়াকে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ’: ‘বুরহান’ (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৬

^{২২} ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রসূল ওয়াল মুলুক’, খণ্ড-২, পৃ.-৪৮৮; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, খণ্ড-২, পৃ.-৫১-৫২; অধ্যাপক আকবরাবাদি, ‘আহদে নাবাওয়াকে গাজওয়াত ওয়া সারয়াহ’: ‘বুরহান’ (দিল্লি), খণ্ড-৭৫, নং-৩ (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫), পৃ.-১৩৮

হিজরি দশম ও একাদশ বর্ষ

খালিদ রাঃ-কে নজরানে এবং আলি রাঃ-কে ইয়েমেনে প্রেরণ

নজরানের খ্রিষ্টানদের মধ্যে কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করে নিলে তখনও অধিকাংশই ইসলামের বাইরে। নবিজি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাঃ-কে নজরানে দাওয়াতি কাজে পাঠিয়ে দেন।^{২৩} তিনি সেখানে কাজ চালিয়ে যান। নজরানবাসীর পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল মদিনায় প্রেরণ করা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। নবিজি তাদের প্রতিনিধি দলটিকে বিশেষ সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

ইয়েমেনে তখনও বহুসংখ্যক পৌত্তলিক রয়ে যায়। নবিজি দশম হিজরির রমজান মাসে^{২৪} আলি রাঃ-কে ৩০০ অশ্বারোহীসহ প্রেরণ করেন। আলি রাঃ সেখানে পৌঁছে ইয়েমেনবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। একটি ছোটোখাটো যুদ্ধ সংঘটিত হলে পৌত্তলিকরা পরাজিত হয়। অবশেষে তারা আত্মসমর্পণ করে নবিজির নিকট একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়।

নবিজির ইন্তেকালের ঠিক পূর্বমুহূর্তে তারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে। আলি রাঃ দশম হিজরির জিলকদ পর্যন্ত ইয়েমেনে অবস্থান করেছিলেন।


বিদায় হজ

তাবুক অভিযানের মধ্য দিয়ে সামরিক অভিযানগুলো প্রায় শেষ হয়ে যায়। এক বছরের মধ্যে (তাবুকপরবর্তী) গোটা আরব সম্পূর্ণরূপে ইসলামি শাসনের অধীনে চলে আসে। মদিনায় নবিজি তখন প্রতিনিধি দলগুলোকে একে একে গ্রহণ করে নিচ্ছেন। আরব উপদ্বীপের চতুর্দিক থেকে আসা মানুষগুলোকে ইসলামি অনুশাসন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। নিম্নোক্ত সূরাটি নাজিলের পর (মক্কা বিজয়ের পর) নবিজি তাঁর দাওয়াতি কাজের পরিসমাপ্তির ব্যাপারে অবগত হয়ে যান।

^{২৩} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-২, পৃ.-১৬৯; ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রসূল ওয়াল মুলুক’, খণ্ড-৩, পৃ.-১২৬; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-২ (খণ্ড-৩ ও ৪), পৃ.-৬৪১

^{২৪} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-২, পৃ.-১৬৯; ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রসূল ওয়াল মুলুক’, খণ্ড-৩, পৃ.-১৩১; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-২ (খণ্ড-৩ ও ৪), পৃ.-৬৪১

‘যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে; আর দেখবে—লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন তোমার রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করবে এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী।’ সূরা নাসর : ১-৩

নবিজি এখন পর্যন্ত ফরজ হজ আদায় করেননি; অর্থাৎ হজ ফরজের বিধান নাজিল হওয়ার পর নবম হিজরিতে সংঘটিত প্রথম হজ পালনে তিনি অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর প্রতিনিধিত্ব দিয়ে আবু বকর -কে পাঠিয়েছিলেন।

দশম হিজরিতে নবিজি মক্কায় তাঁর হজযাত্রায় যাওয়ার কথা সকলকে জানিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গে এই পবিত্র হজযাত্রায় অংশগ্রহণের জন্য আরবের সকল অঞ্চলগুলোতে দূত মারফত খবর পাঠিয়ে দেন।^{২৫} তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া মানুষের সংখ্যা শত কিংবা হাজারে সীমাবদ্ধ থাকেনি; এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় লাখে। হজযাত্রা আরম্ভ করার জন্য মানুষজন এসে মদিনার বহিরাংশে তাঁরু গেড়ে অবস্থান নেয়। নবিজির সাথে হজে অংশ নেওয়ার জন্য গোটা আরব থেকে নারী-পুরুষ মদিনা অভিমুখে যাত্রা করে। ইসলামের ছায়াতলে এসে একত্রিত হয়। এ সংখ্যা বেড়ে লাখের কোটায় পৌঁছায়। বলা হয়ে থাকে, আরাফাতের ময়দানে সে বছর হাজির সংখ্যা ছিল ১,২০,০।

নবিজি তাঁর সাথীদের নিয়ে জিলকদ মাসের ২৬ তারিখ মদিনা ত্যাগ করেন। ছয় মাইল আসার পর জুল-হুলাইফা নামক স্থানে তিনি হজের পোশাক (ইহরাম) পরিধান করেন। সকল সাহাবিও তাঁর অনুসরণে একই কাজ করেন। ইহরাম পরিধানের পর তিনি বলতে আরম্ভ করেন—

‘হে আল্লাহ! আমি হাজির,
আমি হাজির হয়েছি তোমার জন্য,
তোমার কোনো অংশীদার নেই এবং আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি,
সকল প্রশংসা ও সকল নিয়ামত তোমারই,
আর রাজত্বও তোমার; তোমার কোনো অংশীদার নেই।’

কথাগুলো সহস্র কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে। গোটা মরুভূমিই যেন একই ধ্বনিতে, একই সুরে গেয়ে ওঠে। জিলহজের পঞ্চম (কতকের মতে চতুর্থ) দিনে নবিজি মক্কায় পৌঁছান। দুই রাকাত সালাত আদায়ের পর তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ করেন। তারপর পবিত্র কাবার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন—

‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি মহাক্ষমতাবান। তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্যে রূপান্তর করেছেন। তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং সকল দম্ভ-অহংকারীদের তিনি দমন করেছেন।’

^{২৫} ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-২ (খণ্ড-৩ ও ৪), পৃ.-৬০১; ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-২, পৃ.-১৭১; ইবনে জারির আত-তাবারি, ‘তারিখুর-রুসূল ওয়াল মুলুক’, খণ্ড-২, পৃ.-১৪৮; ইবনে আবদুল বার, ‘আদ-দুরার’, পৃ.-২৭৫

স্বভাব, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব

বিশ্বজগতের সকল মহান ব্যক্তির মধ্যে—হোক তিনি নবি, রাসূল, ধর্মীয় কিংবা সমাজ সংস্কারক—নবিজিই একমাত্র ব্যক্তি, যার জীবনী ইসলামের ইতিহাসের গত চৌদ্দ শতাব্দী যাবৎ সবচেয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে নথিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর অভিযানগুলো, তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, আত্মীয়স্বজন, সাহাবিগণ ও অন্যান্যদের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর অনবদ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো পবিত্র কুরআন ও তাঁর মুখ নিসৃত বাণীসমূহ (আল হাদিস) থেকে জানতে পারা যায়। এ সবকিছু এবং গোড়ার দিকের ইসলাম বিশারদগণের কর্মগুলো তাঁর রিসালাতেরই একটি পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করে।

পশ্চিমা ইতিহাসবিদ ও সমালোচকগণ এ ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়েছে— মানবেতিহাসের সকল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বনেতাদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যার জীবনের প্রতিটি অংশ ঐতিহাসিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বসওয়ার্থ স্মিথ লিখেন—‘মুহাম্মাদবাদে প্রতিটি ব্যাপারই ব্যতিক্রম। কোনো অলীকতা বা অস্পষ্টতা ছাড়াই আমাদের কাছে ইতিহাস বর্তমান। মুহাম্মাদের বাহ্যিক ইতিহাস তো আমাদের জানাই—যখন কিনা দাওয়াতি কাজের বাইরের তাঁর অভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়াদিও প্রকাশিত। সংরক্ষিত একেবারে অনুপম ও মৌলিক একটি সংকলন আমাদের কাছে উপস্থিত। দৃঢ় কর্তৃত্বের সাথে তা বিরাজমান রয়েছে, যেন বিশেষ কোনো সন্দেহ ছুড়ে দেওয়ার সাধ্য কারও নেই।’^{২৬}

নবিজির জীবনী লেখকদের ইতিহাসের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. স্প্রেনজার লিখেন—‘এমন কোনো জাতি নেই কিংবা গত ১২টি শতাব্দী সময়কালে এমন কেউ-ই নেই, যারা তাদের প্রত্যেক প্রখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী নথিবদ্ধ করে রেখেছে। যদি মুসলমানদের জীবনীসংক্রান্ত লেখনীগুলোকে একত্র করা হয়, তবে আমরা প্রায় অর্ধ মিলিয়ন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জীবনী পাব...’

অধ্যাপক মারগলিওথ মন্তব্য করেন—‘নবিজির জীবনী লেখকগণ একটি দীর্ঘ ক্রমধারা তৈরি করে ফেলেছেন, যার শেষ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তবে এতে একটি জায়গা করে নেওয়াটা সম্মানজনক ব্যাপার।’

^{২৬}. বোসওয়ার্থ স্মিথ, ‘Mohammad and Mohammedanism’, পৃ.-১৪-১৫

জনাব জন ডেভেন পর্ট তার বই ‘Apology for Muhammad and the Holy Quran’-এ লিখেন—‘সমস্ত আইন নির্মাতা কিংবা বিজেতাগণের মধ্যে মুহাম্মাদের মতো এমন কেউ নেই, যার জীবনী এতটা সত্যাসত্য ও বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।’

এ পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন শিরোনামে নবিজির ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টান্তগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়ার প্রয়াস পাব।

নবিজির আদর্শিক রীতিনীতি ও স্বভাব-চরিত

নবিজির জীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হচ্ছে তাঁর স্বচ্ছতা। তিনি নিজের অনুশাসন অনুযায়ী-ই আচার-আচরণ করতেন। অর্থাৎ মুখে যা বলতেন, কাজেও ঠিক তা-ই করতেন। আচরণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাশয়, সহানুভূতিশীল আর কোমল হৃদয়ের। পবিত্র কুরআনও এ ব্যাপারটির সাক্ষ্য দিচ্ছে এভাবে—

‘আল্লাহর অনুগ্রহে তুমি তাঁদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। যদি তুমি রুঢ় ও কঠিন হৃদয়ের হতে, তাহলে অবশ্যই তাঁরা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত...’ সূরা আলে ইমরান : ১৫৯

পবিত্র কুরআন অন্যত্র বলছে—

‘তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল এসেছে। তোমরা যে বিষয়ে কষ্ট পাও, তা তাঁর জন্যও কষ্টদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।’ সূরা তাওবা : ১২৮

মুয়াজ রাঃ বর্ণনা করেন—

‘নবিজি তাঁকে গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে ইয়েমেন প্রেরণ করেন। প্রেরণের সময় রাসূল সাঃ তাঁকে উপদেশ প্রদান করেন—“মুয়াজ! মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করবে।”^{২৭} নবিজি আরও বলেন— “আমি উত্তম আচরণের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হয়েছি।”^{২৮}

^{২৭}. মুআত্তা ইমাম মালিক, মিশকাত

^{২৮}. মুআত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে আহমাদ, মিশকাত

মুহাম্মাদ ﷺ মানবজাতির জন্য এক রহমতের দরিয়া

আরব উপদ্বীপের দিকে দিকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোত্রগুলোর বংশপরম্পরায় চলে আসা দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান ঘটে। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আরবরা নিজেদের একটি শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে খুঁজে পায়। ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে দস্যুবৃত্তি আর খুনোখুনি ছিল আরবে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কেউ-ই নিজেকে নিরাপদ ভাবে পারত না। ব্যভিচার ছিল একটি মামুলি ব্যাপার, একজন পুরুষ বহু নারীর কাছে গমন করত। বিবাহিত নারীরা (উচ্চ বংশীয়) সন্তান ধারণের জন্য তাদের স্বামী কর্তৃক অন্য পুরুষের সাথে মিলিত হওয়ার অনুমতি পেত।

পুরুষগণ যত ইচ্ছে বিয়ে করত, আর নিজের ইচ্ছেমতো পত্নী ত্যাগ করত। সমাজে নারীদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। ইসলামপূর্ব যুগে আরব নারীদের বিবেচনা করত দাসী হিসেবে। তাদের দিকে তাকাত তাচ্ছিল্যভরে। বহু পিতা তার কন্যা-সন্তানকে হত্যা করেছে। দাসপ্রথা ছিল আরবদের মাঝে জনপ্রিয় একটি রেওয়াজ, আর দাসদের সাথে তাদের আচরণ ছিল খুবই অমানবিক। গোটা আরবসমাজ তখন অনৈতিকতা, কুসংস্কার আর বর্বরতার আখড়া। সর্বোপরি পুরো আরবসমাজ ছিল তখন জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। ইসলামের এই আবির্ভাবকালকে বলা হয় অজ্ঞতার যুগ; আইয়ামে জাহেলিয়াহ।

আরব তৎকালীন প্রগতিশীল দুনিয়া যার ইতিহাসও তেমন জানত না; ঠিক সেই মুহূর্তে নবিজি সমুজ্জ্বল প্রতিভাসিত এক মহান ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হয়ে গোটা এলাকাটিকে ইসলামের গৌরবান্বিত আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলেন। সত্যের আলো যেন প্রতিফলিত হতে থাকে প্রতিটি বালুকণায়।

নবিজি সকল গোত্রগুলোর মাঝে একতা নিয়ে আসেন। থেমে যায় তাদের গোত্রীয় বিবাদ আর নিত্য কলহগুলোও। নবিজি ভবিষ্যদ্বাণী করেন—‘একজন নারী সানা (ইয়েমেন) থেকে মদিনায় একাকী সফর করবে, তার মনে এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো কিছুর ভয় থাকবে না।’

মদিনায় গিয়ে তিনিই বিশ্বে প্রথমবারের মতো লিখিত সনদ তৈরি করেন, যা জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিল। নিশ্চিত করেছিল মুসলিম অমুসলিম প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইহুদিদের সঙ্গে একটি চুক্তি করার মধ্য দিয়ে বিবাদগ্রস্ত ধর্মগুলোর মাঝে স্থায়ীভাবে শান্তি আনয়ন করতে সক্ষম হন। খ্রিষ্টানদের সঙ্গেও তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। (সূরা আলে ইমরান : ৬৪-৮০) তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক বৈষম্যমূলক একটি ঘটনাও ঘটেনি।

আর না তিনি পূর্ববর্তী কোনো নবির ব্যাপারে বিষোদগার করেছেন; বরং মুসলিমদের ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশই হলো পূর্ববর্তী নবি-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

ইসলামে নারীর মর্যাদা রাখা হয়েছে পুরুষের মতোই। সে তার নিজের সম্পত্তি ভোগের অধিকার রাখে। ধর্মই নয় শুধু; গোটা মানবজাতির ইতিহাসে উত্তরাধিকার কিংবা ব্যক্তিগত উপার্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে একজন মুসলিম নারীর অবস্থান অদ্বিতীয়। নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা জ্ঞাপন ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশাসন। নবিজি বলেন—‘মায়ের পায়ের নিচে তোমার জান্নাত এবং নারীরা তাদের স্বামীর ঘরে কর্তৃত্বের অধিকারী।’ তিনি আরও বলেন—‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর (ও পরিবারের) নিকট উত্তম।’ সর্বোপরি নবিজি নারীদের পরিপূর্ণরূপে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন; এমনকী তিনি নারীদের তথাকথিত পুরুষদের দাসত্ব-বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছেন। পছন্দমতো নিজেদের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছেন। পিতা ও মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অংশ নিশ্চিত করেছেন। সম্পূর্ণরূপে কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ করে দিয়েছেন।

বিশ্ব ইতিহাসে নবিজি প্রথমবারের মতো দাসপ্রথা বিলোপ সাধনে সচেষ্ট হন। বহুদিন যাবৎ আরবদের মাঝে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল; এমনকী উপনিবেশায়ন যুগে পাশ্চাত্যেও যার প্রচলন ছিল। এভাবে বহু শতাব্দী পরও পশ্চিমারা দাসপ্রথা উচ্ছেদে তাঁকেই অনুসরণ করেছে। তিনি জোরালোভাবে ঘোষণা করেন, আল্লাহর নিকট দাসমুক্তির চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য কাজ দ্বিতীয়টি নেই। দাসমুক্তিকে ইসলামে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি নিজের মুক্ত করা দাস (এবং পরে পালকপুত্র) জায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন; যে ব্যাপারটি পবিত্র কুরআনেও আলোচিত হয়েছে। (সূরা আহজাব : ৩৭)

সামাজিক বৈষম্য-প্রভেদ দূরীকরণে প্রথম তিনিই এগিয়ে আসেন। প্রচার করেন আল্লাহর বাণী—‘তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে অধিক তাকওয়াবান।’ কোনো বিশেষ জাতি বা রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণের কারণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটি বিষয়। সেজন্য তিনি সমাজে তৈরি বৈষম্যের সকল দেয়াল ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন; যেগুলো সম্পদ, কর্ম কিংবা বর্ণের কারণে বিশেষ শ্রেণিকে এগিয়ে রাখতে চায়। তিনি এমনভাবেই সর্বদেশীয় ও সর্বজাতীয় ভাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন, যা উঁচু-নিচু, ধনী-অসহায়, সাদা-কালো সকলকে একটি অমোঘ বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছে। তিনি ঘোষণা দেন—‘আল্লাহ তোমাদের বংশ কিংবা বাহ্যিক চেহারার দিকে তাকান না, তিনি দেখেন তোমাদের ক্বলব। তোমাদের নিকট সে-ই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যে অধিক তাকওয়াবান।’

রাজনৈতিকভাবেও তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছেন। মানুষকে দিয়েছেন রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে মত প্রকাশের অধিকার, যার চর্চা হতো নবিজি কর্তৃক সংগঠিত বিভিন্ন পরামর্শ সভায় (শূরা)। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি রীতিবদ্ধ শৃঙ্খলা ব্যবস্থা গঠন করেন। রাষ্ট্রে শান্তি ও সংহতি নিশ্চিত করেন।

নবিজির কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুজিজা

ইসলামি পরিভাষায় নবিগণের মাধ্যমে গঠিত অলৌকিক ঘটনাগুলোকে বলা হয় ‘মুজিজাত’ (একবচনে মুজিজা)। এটি এসেছে মূল শব্দ ‘ইজজ’ থেকে, যার অর্থ—অক্ষম হওয়া বা শক্তির ঘাটতি হওয়া। সুতরাং মুজিজা হচ্ছে এমন একটি কাজ, যা মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির বাইরে এবং যা বাস্তবসম্মত উপায়ে কিংবা সাধারণ ও স্বাভাবিক পদ্ধতি দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। পবিত্র কুরআনে মুজিজাকে সাধারণত আয়াত (তথা নিদর্শন) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলোকে ইসলামে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—

আল মুজিজা : এটি এমন অতিপ্রাকৃত ঘটনা, যা কেবল নবিগণের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। এই বইতে অলৌকিক বলতে মূলত মুজিজাকেই বোঝানো হচ্ছে।

আল কারামাত : এটি সে সকল অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে বোঝায়, যেগুলো মুসলিম পুণ্যবান ব্যক্তিগণের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

আল মাউনা : এটি একজন সাধারণ মুসলমানের দ্বারাও ঘটে থাকে।

ইসতিদরাজ : এটি এমন অপার্থিব কাজ, যা কোনো কাফির ও পাপী ব্যক্তির করে থাকে। দাজ্জাল যে সকল কাজগুলো করবে, সেগুলো এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাগুলো গতানুগতিক বা স্বাভাবিকতার বিপরীত। সাধারণত এগুলো স্বচক্ষে ঘটে না দেখলে বা এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলে বুঝে উঠা কঠিন।

আল্লাহ তায়ালা নবিগণের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটান তাঁদের নবুয়তের নিদর্শন (আয়াত) হিসেবে। ইবরাহিম, মুসা, দাউদ, সোলায়মান ও ঈসা ﷺ-এর মুজিজাগুলো বেশ প্রসিদ্ধ। অন্যান্য নবির পাশাপাশি তাঁদের ঘটনাগুলোও পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। নবিজি হলেন সকল নবিগণের নেতা। প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য নবির চেয়ে তাঁর মুজিজাগুলো অধিক অগ্রসর পর্যায়ে।

আল্লামা সোলায়মান নদভী (তাঁর ‘সিরাতুন-নবি’ বইয়ের ৭৯২ পৃষ্ঠা সংবলিত ৩য় খণ্ড) পুরো একটি খণ্ডজুড়ে নবিজির মুজিজাগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ের ওপর আরও যে কাজগুলো হয়েছে—‘দালাইল আন-নবুওয়াহ’—ইমাম বায়হাকি; ‘দালাইলুন-নবুওয়াহ’—মুসতাফারি; ‘দালাইলুন-নবুওয়াহ’—ইমাম নাইম ইসফাহানি এবং ‘খাসাইসুল কুবরা’—ইমাম সুয়ুতি ইত্যাদি।

আল্লামা সোলায়মান নদভী তাঁর বইতে নবিজির প্রায় ২০০ মুজিজার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে, এগুলোর ৪৫টি উল্লিখিত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। বাকি ১৫৫টি এসেছে বিভিন্ন সহিহ হাদিসে। সহিহ হাদিসগুলোর বাইরে যে মুজিজাগুলোর বর্ণনা রয়েছে, সেগুলো হিসাব করলে ২০০ পেরিয়ে যাবে। লেখা সংক্ষেপ করার নিমিত্তে এই বইয়ে নবিজির সবগুলো মুজিজার বর্ণনা নিয়ে আসা সম্ভবপর নয়, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুজিজার বর্ণনা নিচে আলোচনা করছি।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কয়েকটি মুজিজা

মিরাজ

মিরাজ (তথা উধ্বারোহণ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি মুজিজা। এটি ইসরা নামেও পরিচিত। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, অধিকাংশ ইতিহাসবিদদের মতে, এটি সংঘটিত হয় হিজরতের ১৮ মাস পূর্বে। পবিত্র কুরআন এটির উল্লেখ করেছে এভাবে—

‘পবিত্রতা ও মহিমা সেই মহান সত্তার; যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশকে আমি বরকতময় করেছি তাঁকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য। নিশ্চই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।’ সূরা বনি ইসরাইল : ১

পবিত্র কুরআন অন্যত্র বলছে—

‘তখন সে সর্বোচ্চ দিগন্তে। তারপর সে (তাঁর) নিকটবর্তী হলো এবং (তাঁর দিকে) ঝুলে পড়ল (তাঁর একেবারে কাছে চলে এলো); তাঁদের মাঝে মাত্র দুই ধনুক পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কম দূরত্ব ছিল। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যে ওহি পাঠানোর ছিল, তা পাঠালেন।’ সূরা নাজম :

নবুয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি

একজন নবির অভীষ্ট লক্ষ্য

কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ে নবি প্রেরণের তিনটি মৌলিক কারণ থাকে—

১. ইতঃপূর্বে তাদের কাছে কোনো নবি পাঠানো হয়নি।
২. নবি পাঠানো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবিক অর্থে সে জাতি বা সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে তাঁদের অনুশাসন অনুসরণের মতো অবস্থা আর অবশিষ্ট নেই।

৩. অতীতের নবিগণের অনুশাসন সমাজের যথেষ্ট অগ্রগতি বজায় রাখার পক্ষে অপ্রতুল হয়ে পড়া।

আমরা যদি উপরিউক্ত কারণগুলোকে সামনে রেখে নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের কারণের প্রতি দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখতে পাই—ওপরের সবগুলো উপলক্ষ্য তখন বিদ্যমান ছিল। তাঁর দায়িত্ব ছিল বিশ্বব্যাপী। তাঁকে নির্দিষ্ট কোনো জাতির নিকট পাঠানো হয়নি। যে বার্তা তিনি নিয়ে এসেছেন, তা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিকৃতরূপে বিদ্যমান। শুধু তা-ই নয়, তাঁর জীবনের সকল ব্যক্তিগত ও লৌকিক বিষয়ের বিবরণীও বিশুদ্ধ তথ্যসূত্রসহ বর্তমান রয়েছে; যে কেউ সেগুলো সবিস্তারে যাচাই করে নিতে পারে।

তাঁর আনীত বার্তা নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ এবং তাঁর দাওয়াত, উপদেশাবলি ও নির্দেশনাগুলো সর্বজনীন। মানবজীবনের এমন কোনো আচার-অনুষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপ নেই, যে ব্যাপারে নবিজির নির্দেশনা পাওয়া যায় না। সেজন্যই মুহাম্মাদ ﷺ হলেন সকল নবিদের মধ্যে শেষনবি। আর দুনিয়াতে নবি আগমনের কোনো প্রয়োজন নেই।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হলো—

ক. নবিজির দায়িত্ব বিশ্বব্যাপী : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

‘বলো, হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি আসমান ও জমিনের রাজত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূল ও নিরক্ষর নবির প্রতি ঈমান আনো, যে আল্লাহ ও

তাঁর বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যেন সঠিক পথের সন্ধান পাও।’ সূরা আ’রাফ : ১৫৮

‘আমি তো তোমাকে সব মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না।’ সূরা সাবা : ২৮

অন্যত্র ঘোষণা হচ্ছে—

‘আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমতরূপেই পাঠিয়েছি।’ সূরা আশিয়া : ১০৭

আবার বলা হচ্ছে—

‘রমজান মাস, এ মাসেই নাজিল করা হয়েছে আল কুরআন; মানবজাতির জন্য দিকনির্দেশনা...’ সূরা বাকারা : ১৮৫

খ. তাঁর আনিত বার্তার যথাযথ সংরক্ষণ : আল্লাহ সুবহান ওয়া তায়ালা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন, কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

‘আমিই কুরআন নাজিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণ করব।’ সূরা আল হিজর : ৯

তিনি আরও বলেন—

‘যখন তাদের আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়, তখন যারা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রত্যাশী নয়, তারা বলে—“তুমি এটা ছাড়া অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো কিংবা এটাকে পরিবর্তন করো।” তুমি বলো—“আমি তো নিজের পক্ষ থেকে এটা পরিবর্তন করতে পারি না। আমার কাছে যে ওহি আসে, আমি শুধু তা-ই মেনে চলি। আমি যদি আমার প্রভুর কথার অন্যথা করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমার এক মহা দিবসের শাস্তির ভয় রয়েছে।”’ সূরা ইউনুস : ১৫

উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআন পূর্বে নাজিলকৃত অন্যান্য আসমানি কিতাবগুলোকে সেগুলোর অনুসারীদের জন্য বিলুপ্ত ঘোষণা করে—

‘হে আহলে কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল এসেছেন। তোমরা (আল্লাহর) কিতাবের যা যা গোপন করেছ, তিনি তাঁর অনেক কিছু তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন, অনেক কিছু মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সম্ভ্রুতি লাভ করতে চায়, এই কিতাব দ্বারা তিনি তাদের শাস্তির পথ দেখান। নিজ হুকুমে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন। সরল পথে পরিচালিত করেন।’ সূরা মায়দা : ১৫-১৬

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী ও সন্তানাদি

নবিজির স্ত্রীগণ

এ অধ্যায়ে আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের ব্যাপারে খুবই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করব এবং বিভিন্ন বিবাহের পেছনের কারণগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ رضي الله عنها : আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রথম। বিবাহের সময় খাদিজা ছিলেন ৪০ বছর বয়সি বিধবা নারী। নবিজির বয়স ছিল পঁচিশ বছর। অধ্যাপক হামিদুল্লাহ অভিমত প্রকাশ করেন—‘বেশ কিছু বর্ণনামতে সে সময় খাদিজার বয়স ছিল ২৮।’^{২৯} তাঁর আগের স্বামী ছিলেন আতিক ইবনে আইজ। তাঁর এক কন্যা ছিল হিন্দ, যিনি পরিবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আতিক ইবনে আইজের ইন্তেকালের পর তিনি আবু হালাহর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সে ঘরে তাঁর দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে—হিন্দ ও হালাহ।

আবু হালাহ ইন্তেকাল করার পর তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে। খাদিজা رضي الله عنها নবুয়তের দশম বছরের রমজান মাসে ধরাধামের মায়া ত্যাগ করে পরলোকগমন করেন। সে সময় তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ষাট বছর। তাঁর জীবদ্দশায় রাসূল ﷺ অন্য কোনো নারীকে বিবাহ করেননি।

মৃত্যুর পর নবিজি নিজ হাতে তাঁকে সমাহিত করেন। তখনও পর্যন্ত জানাজার নামাজের হুকুম অবতীর্ণ হয়নি। তাঁকে মক্কার মালায় মুসলমানদের সাধারণ গোরস্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। কবরটি এখনও চিহ্নিত রয়েছে।

সাওদা বিনতে জাময়া رضي الله عنها : সাওদা বিনতে জাময়া ইবনে কায়েস رضي الله عنه ছিলেন নবিজির দ্বিতীয় স্ত্রী। তিনিও ছিলেন একজন বিধবা। ইতঃপূর্বে তাঁর চাচাতো ভাই শুকরান ইবনে আমরের সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল।^{৩০} এই দম্পতি ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং (দ্বিতীয় দফায়) আবিসিনিয়ায় হিজরতও করেছিল। শুকরান সেখানে ইন্তেকাল করেন এবং সাওদা رضي الله عنها মক্কা ফিরে আসেন।

^{২৯} ড. মু. হামিদুল্লাহ, ‘মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ’, পৃ.-১৪৪

^{৩০} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫২; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-২, (খণ্ড-৩ ও ৪), পৃ.-৬৪৪

খাদিজার ইন্তেকালের পর একই বছরের শাওয়াল^{৩১} মাসে নবিজি সাওদা রাঃ-কে বিবাহ করেন। আয়িশা রাঃ-কে বিবাহ করার সাওদা রাঃ আশঙ্কা করেন, তাঁকে তালাক দেওয়া হবে অথবা রাসূল সঃ সাওদা রাঃ-কে এক তালাক দেন। সাওদা রাঃ বলেন—‘আল্লাহর নবি! আমি আমার জায়গাটি আয়িশা রাঃ-এর জন্য ছেড়ে দিতে প্রস্তুত রয়েছি। অন্যত্র বৈবাহিক জীবনের প্রতি আমার আর কোনো আগ্রহই নেই (বয়সের কারণে), কিন্তু আমার ইচ্ছে—কিয়ামত দিবসে আমি আপনার স্ত্রী হিসেবেই উঠতে চাই।’^{৩২} রাসূল সঃ সাওদা রাঃ-কে রেখে দেন। অধ্যাপক হামিদুল্লাহ বলেন—‘নবিজি তাঁর ব্যক্তিজীবনে প্রত্যাহারযোগ্য তালাকেরও একটি দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন।’^{৩৩} সাওদা রাঃ ৫৫ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।^{৩৪} কতক ইতিহাসবিদদের মতে, তিনি উমর রাঃ-এর খিলাফতকালে ১৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।^{৩৫}

আয়িশা বিনতে আবু বকর রাঃ : নবিজির স্ত্রীদের মধ্যে আয়িশা রাঃ ছিলেন একমাত্র কুমারি।^{৩৬} তাঁরও বিবাহ হয়েছিল নবুয়তের দশম বছরের শাওয়াল মাসে (সাওদা রাঃ-কে বিবাহ করার পর)।^{৩৭} আয়িশা রাঃ ছিলেন আবু বকর রাঃ-এর কন্যা। বিবাহকালে বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে তাঁকে পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আয়িশা রাঃ হিজরি দ্বিতীয় বর্ষ থেকে নবিজির সঙ্গে থাকতে শুরু করেন।^{৩৮} তিনি ৫৭ হিজরির রমজান মাসে মঙ্গলবার রাতে ইন্তেকাল করেন।^{৩৯} মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ছেষটি বা সাতষটি বছর। তাঁর সময়ের সবচেয়ে জ্ঞানবান রমণী ছিলেন তিনিই।

হাফসা বিনতে উমর রাঃ : হাফসা রাঃ উমর রাঃ-এর কন্যা। তিনি নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমবার তাঁর বিবাহ হয়েছিল খুনাইস ইবনে হুজাইফা রাঃ-এর সাথে।^{৪০} যিনি ছিলেন একেবারে শুরুর দিকে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। খুনাইস রাঃ প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন। বদরেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

^{৩১} ইবনে সাদের মতে—১০ম হিজরির রমজান মাসে। দ্র. ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫৩

^{৩২} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫৪

^{৩৩} ড. মু. হামিদুল্লাহ, ‘মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ’, পৃ.-১৪৫

^{৩৪} ইবনে সাদ বর্ণিত একটি হাদিস মতে, তিনি ৫৪ হিজরির শাওয়াল মাসে ইন্তেকাল করেন। ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫৫

^{৩৫} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫৫

^{৩৬} ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-২ (খণ্ড-৩ ও ৪), পৃ.-৬৪৪

^{৩৭} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫৮

^{৩৮} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৫৮

^{৩৯} ইবনে সাদের মতে, রমজান মাসে ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৮০

^{৪০} ইবনে সাদ, ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’, খণ্ড-৮, পৃ.-৮১; ইবনে হিশাম, ‘সিরাতুন-নববিয়াহ’, বই-২ (খণ্ড-৩ ও ৪), পৃ.-৬৪৫